অপরিহার্য ইনভিজিবল টেকনোলজি

গোলাপ মুনীর

আজকাল আমরা যখন টেকনোলজির কথা মাথায় আনি, তখন সবার আগে ভাবনায় আসে ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি তথা আইসিটির কথা। আর আইসিটি বিষয়টি মাথায় নিয়ে চারপাশে তাকালে প্রথমেই দৃষ্টি আটকে যায় কতগুলো পার্সোনাল গেজেট বা ডিভাইসে– ডেস্কটপ পিসি, ট্যাবলেট পিসি, ল্যাপটপ, নানা ধরনের স্মার্টফোন ইত্যাদি সব দৃশ্যমান বা ভিজিবল পিসির ওপর। ফোন বা ট্যাবলেট পিসি হচ্ছে ভিজিবল টেকনোলজির নিছক লাস্ট লাইন, যেখানে ইনভিজিবল ডিভাইস বা টেকনোলজির লাইন এর তুলনায় অনেক বেশি সুদীর্ঘ। এসব ইনভিজিবল ডিভাইস বা টেকনোলজি রাত-দিন আমাদের জোগাচ্ছে নানা ধরনের সেবা।

কমপিউটার জগৎ পরিবারের প্রতিজন সদস্য শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছেন একটি সরল লক্ষ্যকে সামনে রেখে : যথাসময়ে যথাযথ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির সোপানে নিয়ে পৌঁছানোর সম্ভাবনার কথা সম্মানিত পাঠকসাধারণ ও সেই সাথে দেশবাসীকে জানানো। আমরা মনে করি, আমাদের পাঠকেরা সমাজের সবচেয়ে প্রযুক্তিসচেতন এক গোষ্ঠী। এরা আমাদের নীতিনির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর কার্যকর প্রভাব সৃষ্টি করতে যথার্থ অর্থেই সক্ষম। এ উপলব্ধিকে মাথায় রেখেই আমরা এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে পাঠকদের নজর দৃশ্যমান প্রযুক্তির জগৎ থেকে সরিয়ে অদৃশ্য প্রযুক্তির দিকে নিয়ে যেতে চাই। কেননা, এ অদৃশ্য বা ইনভিজিবল প্রযুক্তির ব্যাপারে জাতি হিসেবে আমাদের সচেতনতার মাত্রা খুব একটা সুখকর নয়। আশা করি, বক্ষমাণ প্রচ্ছদ প্রতিবেদন পাঠে পাঠক ইনভিজিবল টেকনোলজির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন। এ প্রযুক্তির জগতে রয়েছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মবীর, যাদের আমরা বিশ্ববাসী স্মরণ করি খুব কমই। অথচ এ ইনভিজিবল টেকনোলজিই আমাদের উপহার দেবে আরও উন্নততর পৃথিবী। শুরুতেই জানিয়ে রাখি, সীমিত কয়েক পৃষ্ঠার এ প্রতিবেদন এসব টেকনোলজির খুব একটা বিস্তারিতে যাওয়ার সুযোগ কম। তারপরও আমাদের বিশ্বাস, এ লেখা পাঠকের পাঠক্ষুধা মেটাতে সক্ষম হবে। বিশেষ করে তা পাঠকসাধারণকে ইনভিজিবল টেকনোলজির গুরুত্ব উপলব্ধিতে সহায়ক হবে। এখানে যেসব ইনভিজিবল টেকনোলজি সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব, তার মধ্যে আছে: নেটওয়ার্ক, আইডেন্টিফিকেশন, অটোমেশন, সেন্সর এবং ইঞ্জিন অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট।

নেটওয়ার্ক

এখানে আলোচ্য বিষয়গুলোর আলোচনাক্রম এসবের গুরুত্ব বিবেচনা করে সাজানো হয়নি। তবে যদি তা বিবেচনায় আনা হতো তবুও নেটওয়ার্ক বিষয়টি সবার আগেই আলোচনায় আসত। কারণ, নেটওয়ার্ক ছাড়া প্রযুক্তির সবকিছুই অচল, সবকিছুই মৃত, সব ডিভাইসই সিলিকন আর ধাতুর অকেজো পিণ্ড।

লাখো-কোটি মানুষ সচল রেখেছে অদৃশ্য নেটওয়ার্ক

আপনি যে প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন, কিংবা যে প্রযুক্তির প্রভাব বলয়ের বাসিন্দা, সে প্রযুক্তি সম্পর্কে একবার ভাবুন তো। দেখা যাবে, সে প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক-চালিত। সোজা কথায় নেটওয়ার্ক টেকনোলজি-ড্রিভেন। ল্যান্ডফোন কিংবা মোবাইল ফোনে কথা বলেন, সেখানেও তা চলছে নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই। কোনো ওয়েব ব্রাউজ করছেন, সেটিও একটি নেটওয়ার্ক। ফোনসেটের সাথে সংযোগ সৃষ্টিকারী ব্লুটুথ হেডসেট, ফোনে বা অনলাইনে টিকেট বুকিং, বিল পরিশোধ, ব্যাংক বা এটিএম বুথ থেকে টাকা তোলা, ই-মেইল কিংবা এসএমএস পাঠানো বা পাওয়া, ঘরের বৈদ্যুতিক পাখা-বাতি-টিভি চলা ইত্যাদিসহ আরও অনেক কিছুই চলছে নেটওয়ার্কের জোরে। নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, নেটওয়ার্ক কত পরিব্যাপক।

প্রযুক্তির জগতে নেটওয়ার্ক নতুন কোনো বিষয় নয়। বলা হয়, নেটওয়ার্ক আমাদের পৃথিবীর মতোই পুরনো এবং মানবজাতির চেয়েও পুরনো। বিজ্ঞানপাঠে আমরা জানতে পারি, প্রায় ৪০০ কোটি বছর আগে প্রাইমর্ডিয়েল স্যুপ বা আদিকালীন মৌলরস থেকে আসা পৃথিবীর প্রথম বহুকোষী প্রাণসত্তা তথা মাল্টি-সেল্ড অর্গানিজমও নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেছিল। সেল বা কোষগুলো পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল রাসায়নিকভাবে। আর হ্যাঁ, আমাদের সবাই প্রকৃতিতে সবচেয়ে জটিল নেটওয়ার্কের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আসলে আপনি-আমি যে নেটওয়ার্ক, তাতে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন সেল পরস্পরের সাথে কথা বলে অর্গান বা ইন্দ্রীয় অবয়বগুলো গড়ে তোলার ব্যাপারে। মাল্টিপল অর্গানগুলো পরস্পরের সাথে সংযুক্ত স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভাস সিস্টেমের মাধ্যমে। সব অর্গানই সংযুক্ত আপনার-আমার সিপিইউ তথা ব্রেনের সাথে, যা পৃথিবীতে আমাদের ব্যবহারের একটি সিঙ্গল পিসি, গেজেট বা ডিভাইসের নেটওয়ার্কের চেয়ে অনেক অনেক বেশি জটিল। ইন্টারনেট নামের নেটওয়ার্কও সে তুলনায় নস্যি। আজকের দিনে আমরা প্রযুক্তির জগতে নানা নেটওয়ার্কের ব্যবহারের কথাই জানি-শুনি। এসবই প্রকৃতিতে ▸

বিদ্যমান নেটওয়ার্কের একেকটি নিকৃষ্ট প্রতিলিপি বা রেপ্লিকা। আমরা আজ বিস্ময়কর অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ডিএসএলআর (ডিজিটাল সিঙ্গল-লেন্স রিফ্লেক্স) ক্যামেরা বা নতুন ফোর-কে টিভি নিয়ে। মনে রাখবেন, আপনার চোখের রেজ্যুলেশনের পরিমাণ ৫০০ থেকে ৬০০ মেগাপিক্সেল, অর্থাৎ ৬০০,০০০,০০০ পিক্সেল পর্যন্ত। আর চোখ-মস্তিষ্ক (আই-ব্রেন) নেটওয়ার্ক এ পর্যন্ত তৈরি করা সব টিভিতে ব্যবহৃত সব চিপের চেয়ে অনেক বেশি জটিল। এবার আলোকপাত করতে চাই এমন কিছু নেটওয়ার্কের ওপর, যা সত্যিকার অর্থে আমাদের কাজের ক্ষমতাকে অনেকগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

ফিন্যান্সিয়াল নেটওয়ার্ক : এ নেটওয়ার্ক গড় তোলা হয়েছে একগুচ্ছ কমপিউটার ও সার্ভারকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে। নিশ্চিতভাবেই এটি অন্যান্য নেটওয়ার্কের মতো একটি সাধারণ নেটওয়ার্ক। কিন্তু এটি গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্কগুলোর একটি। এ নেটওয়ার্ক গোটা পৃথিবীটাকে সচল রাখে। নেটওয়ার্ক ছাড়া আমাদের জানার কোনো সুযোগ থাকবে না, কী পরিমাণ অর্থ আমাদের আছে। প্রকৃতপক্ষে, এরই মধ্যে কঠিন হয়ে পড়েছে আমাদের অর্থের পরিমাণ জানা। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। অনুমান করা যাক, সারা পৃথিবীতে নগদ অর্থের পরিমাণ ৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এখন বিশ্বের সব দেশের মূল্যের সাথে এর তুলনা করুন– যা ৭০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। হতে পারে আপনার পকেটে আছে এর মাত্র ২০০ ডলার, আরও ১ লাখ ডলার হয়তো আছে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। কিন্তু হতে পারে আপনি এর চেয়েও বেশি সম্পদের মালিক। আমাদের কাছে মূল্যাবধারণের সরল উপায় আছে– ধরুন কমপিউটার জগৎ-এর বর্তমান সংখ্যাটি আপনি কিনেছেন ৭০ টাকা দিয়ে। কিন্তু কমপিউটার জগৎ থেকে আপনি যেটুকু উপকৃত হলেন, তার মূল্যমাত্রা এই ৭০ টাকার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। অতএব পৃথিবীতে যত নগদ অর্থ আছে, প্রকৃত মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশি।

জানবেনও না কখন আপনাকে মনিটর করা হচ্ছে

ফিন্যান্সিয়াল নেটওয়ার্ক কীভাবে কাজ করে? আপনি চাকরিজীবী। মাস শেষে বেতন পান। সে বেতনের অর্থ জমা হয় একটি অ্যাকাউন্টে। সেখান থেকে একটা অংশ তুলে নেন খরচের জন্য। অ্যাকাউন্ট থেকে কত টাকা তুলে নিলেন, তার সঠিক হিসাব রাখে ব্যাংক। জমার টাকা থেকে তুলে নেয়া টাকা বাদ দিয়ে হিসাব লিখে রাখা হয়। আবার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হলে তা যোগ হয়। এর জন্য জটিল এক নেটওয়ার্কজুড়ে ডাটা ফ্লাইং করতে হয়। তা করতে হয় নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করে। কখনও কখনও এ নেটওয়ার্ক একযোগে ব্যবহার করে বহু ব্যাংক। যখন আপনি অন্য এক ব্যাংকের এটিএম ব্যবহার করেন, তখন এমনটি ঘটে। এখন তা ভাবুন শতকোটি গুণে বাড়িয়ে। তখন বুঝে আসবে বিশ্বে ফিন্যান্সিয়াল নেটওয়ার্ক কত ব্যাপক ও কত জটিল।

চেক, ডিডি, অনলাইনে টাকা পাঠানো, মুদ্রা বিনিময় হার ইত্যাদি নানা কাজে একই ধরনের ব্যবস্থা কাজ করে। এভাবেই অর্থের মূল্যাবধারণের কাজটি পুরোপুরি নির্ভরশীল নেটওয়ার্কিংয়ের ওপর।

পার্সোনাল নেটওয়ার্ক : ইন্টারনেট এককভাবে নির্ভরশীল নেটওয়ার্কিংয়ের ওপর। এ বিষয়টি এরই মধ্যে আপনার জানা হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও নেট সম্পর্কে আমাদের আরও অনেক কিছুই রয়ে গেছে অজানা। আগের চেয়ে আরও বেশি করে নেটকে আমাদের জানতে হবে। কেননা স্মার্ট এসি থেকে শুরু করে ফোন, ট্যাবলেট থেকে পিসি, প্রাইভেট কার থেকে স্যাটেলাইট ইত্যাদি আজ আটকা পড়েছে মানবসৃষ্ট জটিল ডিজিটাল অর্গানিজমে।

ধরুন, এ মুহূর্তে আপনি আপনার ফোনে গুগল সার্চ করতে চাইছেন। মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডারের সেলফোন টাওয়ার আপনার রিকুয়েস্ট পাঠাবে একটি বেস স্টেশনে। সেখান থেকে তা যাবে আইপি নেটওয়ার্কে। এরপর যাবে সবচেয়ে কাছের গুগল সার্ভার আইপিতে। সেখান থেকে অনুরোধ যাবে সার্চটার্ম খোঁজে দেখার জন্য। এরপর সেখান থেকে সার্চ রেজাল্ট ফিরে আসবে। আপনি যদি গাড়ি চালানো অবস্থায় সেল টাওয়ারে সুইচ করেন, নেটওয়ার্ক সে ব্যাপারে জানবে এবং সে অনুযায়ী সঠিক স্থানের টাওয়ারে আপনার ডাটা পাঠাবে। এসব কাজ সম্পন্ন হবে চোখের ফলকে। তা সত্ত্বেও আজকের দিন ও যুগ হচ্ছে পার্সোনাল নেটওয়ার্কের যুগ। ল্যান কিংবা ওয়াইফাই সংযুক্তির মাধ্যমে আপনার বাড়ি কিংবা অফিসের গেজেট ইন্টানেটের সাথে সংযুক্ত থাকুক, সেটা কোনো বিবেচ্য নয় এখানে। একটি প্রিন্টার অথবা একটি শেয়ার্ড ফোল্ডার, একটি এনএএস (নেটওয়ার্ক অ্যাটাচড স্টোরেজ) ডিভাইস, আপনার স্মার্টটিভি, অথবা ডিএলএনএ (ডিজিটাল লিভিং নেটওয়ার্ক অ্যালায়েন্স) কম্প্যাটিবল হার্ডওয়্যার– এসবই হোম নেটওয়ার্ক। অধিকন্তু, এরই মধ্যে পরিধানযোগ্য ডিভাইসের জন্য আমরা ঢুকে গেছি পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্কে। দিন দিন অগ্রসর হচ্ছি আরও জটিল লোকাল নেটওয়ার্কের দিকে, যা আরও বৃহত্তর পরিসরে সংযুক্ত করতে সক্ষম। সম্ভবত আমরা একে আরও সর্বোত্তমভাবে অভিহিত করতে পারি একটি অর্গানিজম হিসেবে ইন্টারনেট অথবা সাধারণভাবে সব নেটওয়ার্কড ডিভাইসের এক ইভ্যুলেশন বা বিবর্তন, যেখানে রয়েছে এর নিজস্ব প্রাণশক্তি বা লাইফ ফোর্স।

ক্লাউড : নিঃসন্দেহে ক্লাউড হবে আমাদের ভবিষ্যতের সবচেয়ে ইনভিজিবল স্টোরেজ সম্ভাবনা। পৃথিবীর কোথাও আপনার স্টোরেজের স্থান করে দেয়ার জন্য ক্লাউড সার্ভিস এককভাবে নির্ভরশীল নেটওয়ার্কের ওপর। তা ভাগাভাগি হয় বিভিন্ন সার্ভারে। ঠিক যেমনিভাবে সাইবার স্পেসে টুকরো টুকরো হয়ে থাকে বিভিন্ন ডাটা। ক্লাউড হতে পারে আপনার পছন্দের স্টোরেজ। এরই মধ্যে আপনার ই-মেইল অথবা ফেসবুক অ্যাকাউন্টে স্টোর হওয়া ডাটা, আপনার পছন্দের আরও ডাটা ও বাকি জীবনের ডাটা আপনার ড্রাইভ এবং মেমরিকার্ড থেকে আফলোড করে স্টোর করতে পারেন ইনভিজিবল ক্লাউডে। নেটওয়ার্কিং তা সম্ভব করে তুলেছে। এমনকি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং আমাদের ন্যাচারাল নেটওয়ার্কিংয়ের এক রূপ। নেটওয়ার্কিং ধীরে ধীরে ফিরে যাচ্ছে আমাদের শেকড়ের সেই নেটওয়ার্কিংয়ে, যার সূচনা হয়েছিল শত শত কোটি বছর আগে।

আইডেন্টিফিকেশন

প্রযুক্তির এ বিস্ময়কর যুগে আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আইডেন্টিফিকেশন। সোজা কথায় এটুকু জানা– আপনি অবশ্যই আপনি এবং আমি অবশ্যই আমি। আমি বা আপনি অন্য কেউ নই। আপনি চাইবেন না, অন্য কেউ আপনার পরিচয় দিয়ে ব্যাংক থেকে আপনার টাকা তুলে নিক। কিংবা আপনার পরিচয় দিয়ে অন্য কেউ কোনো অপরাধ করে বেড়াক। শত শত কোটি ডলার খরচ করে চেষ্টা চলেছে– আপনি যেসব টেকনোলজি ইন্টারফেস করেন, তা যাতে আপনার নিশ্চিত পরিচিতি জেনে নিতে পারে। শুধু মানুষের পরিচয়ই নয়– অগণিত যন্ত্রাংশ, পণ্য, পুরনো গাড়ি, ডিভাইস ইত্যাদি সবই যথাযথভাবে চেনা দরকার।

ধরুন, আপনি নতুন কোনো জায়গায় যাচ্ছেন। আপনার ব্যাগে কী আছে আপনি জানেন, অন্যরা জানেন না। আপনার মতো হাজারো যাত্রী এয়ারপোর্ট থেকে বিমানে গিয়ে উঠছেন বিভিন্ন গন্তব্যে যাওয়ার জন্য। সাথে হাজারো ব্যাগ তল্লিতল্পা। বিমানবন্দরে যাত্রীদের কাছ থেকে বুঝে নেয়া এসবই সঠিক যাত্রীর কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন টেকনোলজির সুবাদে। কোনোটা হারিয়ে গেলে তা ফিরিয়ে দেয়ার কাজেও ব্যবহার হচ্ছে এ একই প্রযুক্তি। অনেক বিস্ময়কর কাজটি সম্পন্ন হয় আইডেন্টিফিকেশন টেকনোলজির মাধ্যমে। দুয়েকটির ওপর আলোকপাত করা যাক।

আরএফআইডি : আরএফআইডি। পুরো কথায়– রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন। এগুলো হচ্ছে ট্যাগ বা মুড়ি। এ ট্যাগ সহজে প্রায় সবকিছুতেই লাগানো যায়। মোটরগাড়ির যন্ত্রাংশ থেকে শুরু করে মানুষের ওপর, পোষা প্রাণী ও খাদ্যপণ্যের ওপর। এ ট্যাগ স্পর্শ না করে লাগাতে পারবেন না। এ ট্যাগসহ আপনার গাড়ি যদি এর সেন্সরসমৃদ্ধ কোনো টুলবুথ অতিক্রম করে, তবে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টুলের অর্থ কেটে নেয়া হবে। আরেক ধরনের ইএএস ▸

(ইলেকট্রনিক আর্টিকল সার্ভিল্যান্স) সিস্টেম রয়েছে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে রোধ করে দোকানের পণ্য চুরি, যা শপলিফটিং নামে পরিচিত। আরএফআইডি ট্যাগ দুই ধরনের : প্যাসিভ ও অ্যাক্টিভ। প্যাসিভ ট্যাগের জন্য প্রয়োজন একটি অ্যাক্টিভ রিডার। উল্টোভাবে বললে অ্যাক্টিভ ট্যাগের জন্য প্রয়োজন প্যাসিভ রিডার। প্যাসিভ রিডারের কোনো ব্যাটারিশক্তি নেই। ট্যাগ রিডার ট্যাগকে সক্রিয় করে তুলে তা পাঠ করে। অ্যাক্টিভ ট্যাগ সাধারণত ব্যাটারিতে চলে এবং তা নিজের সিগন্যাল বিকিরণ করে। এমনকি তা একটি অ্যাক্টিভ রিডার পিকআপ করতে পারে। স্পষ্টতই অ্যাক্টিভ রিডার তুলনামূলকভাবে বেশিদূর থেকে পাঠ করা যায়। ফলে এটি বড় বড় পরিবহন ব্যবস্থার জন্য বেশি উপযোগী। এগুলো কর্পোরেট অফিসে সাধারণত এমপ্লয়ি কার্ড হিসেবেও পাওয়া যায়, যা কোনো ভবন থেকে আপনার সাইন-ইন ও সাইন-আউট হিসেবে ব্যবহার হয়। কিংবা আপনি যদি কোনো ভবনে বা ভবনের কোনো তলায় যাওয়ার অনুমোদন না থাকে, তবে তা আপনাকে সেখানে ঢুকতে বাধা দেবে।

প্যাসিভ ট্যাগ তুলনামূলক সস্তা ও আকারে ছোট। তবে এর ওয়ার্কিং রেঞ্জ খাটোতর। এগুলো বেশি ব্যবহার হয় মল ও রিটেইল আউটলেটে। এছাড়া ছোট ছোট রফতানি পণ্যে ও কুরিয়ার করা পণ্যে এর ব্যবহার হয় পণ্য চেনার কাজ সহজ করে তোলার জন্য। খুব বেশিদিন দেরি নয়, যেদিন আরএফআইডি আমাদের সবার জীবনকে আরও সহজ করে তুলবে। ধরুন, আপনি একটি শপিং মলে ঢুকে শপিংকার্টে করে কেনা পণ্য নিয়ে পেমেন্ট এরিয়ায় গিয়ে ঢুকলেন। দেখলেন এরই মধ্যে আপনার বিল রেডি। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট কিংবা বিরক্তিবোধের কোনো দরকার নেই। শোনা যাচ্ছে, আপনার দেহেও আরএফআইডি অ্যাম্বেড করা যাবে। কোনো কোনো দেশে কেউ কেউ তাদের পোষা প্রাণীর দেহে তা করছে আপনাকে প্রবেশানুমতি দেয়া কিংবা কোনো ভিজিবল অ্যাকশন ছাড়া আপনার উপস্থিতি জানার জন্য। সত্যিকার অর্থে পণ্যের আইডেন্টিফিকেশনের কাজে ভবিষ্যতে এ আরএফআইডি পালন করবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

অগ্রসর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হতে পারে মানবসমাজের সব সমস্যার সমাধান

অথেন্টিকেশন : আরএফআইডি প্রধানত পণ্য চেনার জন্য। আর অথেন্টিকেশন নিশ্চিত করবে আপনার আইডেন্টিটি বা পরিচয়। বর্তমানে এ কাজটি করার সবচেয়ে সাধারণ উপায় হচ্ছে ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড কম্বিনেশন। আমরা সবাই কোনো না কোনো পয়েন্টে অথেন্টিকেশন ব্যবহার করছি প্রতিদিন। ই-মেইলে কিংবা ফেসবুকে লগইন করি।

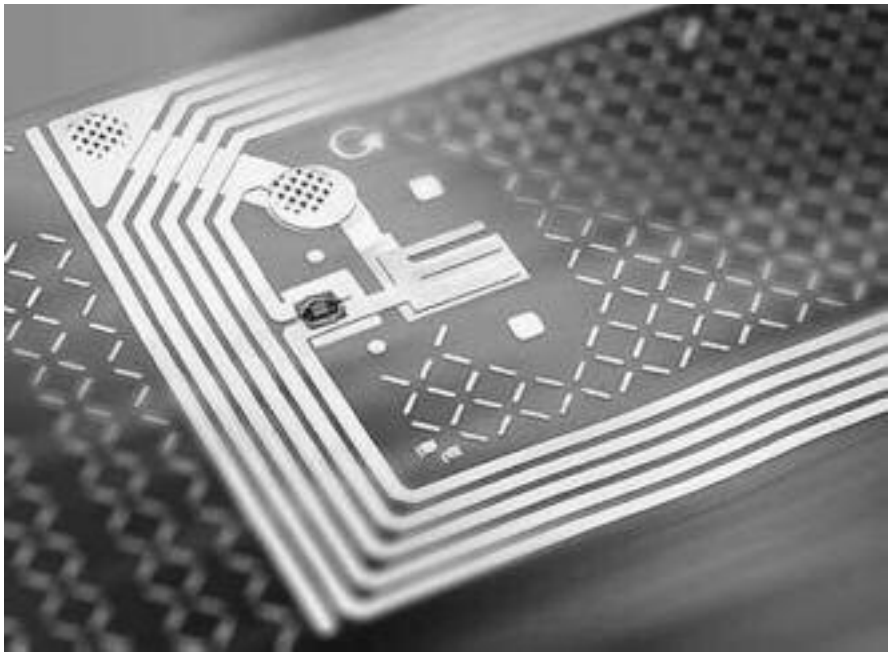
এ ক্ষুদ্র নেটওয়ার্ক সংস্করণই মেটাতে পারে অথেন্টিকেশনের চাহিদা

এটিএম বুথ থেকে টাকা তোলার সময় পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার ঢোকাই। মোবাইলের বিল পরিশোধের সময় ব্যবহার করি অনন্য গোপন পাসওয়ার্ড। বায়োমেট্রিক মেশিনের সামনে আঙুল দোলাই। গাড়ির অটোকপের তালা খুলি একটি বাটন দিয়ে। অথবা বাসার সামনে দরজার তালা খুলি চাবি দিয়ে। এসব ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করছি কোনো না কোনো ধরনের অথেন্টিকেশন। এটি নতুন কোনো ধারণা নয়। প্রাণিকুল গন্ধ বা ফেরোমোনস ব্যবহার করে পরস্পরকে চেনার জন্য। এভাবেই একপাল পশুর মধ্যেও মা-পশু এর শিশুসন্তান-পশুকে চিনে নেয়। এমনকি মায়ের পেটের ভ্রূণও মায়ের কণ্ঠ শুনতে পায়, আর জন্মের পর শিশু মায়ের কণ্ঠ শুনে মাকে চেনার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। এ সবই অথেন্টিকেশন।

ডিজিটাল জগতের কাজ-কারবার যন্ত্র নিয়ে। আর আজ পর্যন্ত আমাদের তৈরি সবচেয়ে স্মার্ট মেশিনটিও এক ঘণ্টা বয়েসী একটি শিশুর মতো স্মার্ট নয়। ডিজিটাল জগতে প্রয়োজন চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের আরও সিমপ্লিস্টিক সিস্টেম– ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড, ডিজিটাল সিগনেচার, প্রাইভেট ও পাবলিক কি কম্বিনেশন, গোপন পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার এবং বাবা-মায়ের নামের মতো নানা ব্যক্তিগত তথ্য।

একটি হিট অর মিস, ইয়েস অর নো, ব্ল্যাক অর হোয়াইট সিস্টেম থাকাটাই সুবিধাজনক। কিন্তু প্রযুক্তির জগতের বিষয় আরও জটিল। যেমন, সফটওয়্যার ইনস্টল কিংবা আনইনস্টল করার জন্য আপনার পিসিতে শুধু আপনারই পূর্ণ অ্যাক্সেস থাকা উচিত। কিন্তু এরপরও আপনি চান অন্যরা আপনার পিসি ব্যবহার করে সার্ফ ও মেইল চেক করুক। একটি ডাটাবেজ সিস্টেম দরকার হতে পারে, যাতে করে একদল মানুষ ডাটা রিড করতে পারে। আরেকটি লাগবে ডাটা রাইট করার জন্য। এগুলোও অথেন্টিকেশনের সরলতম চিত্র।

ডিজিটাল অথেন্টিকেশন সমস্যা আরও জটিল। মানবিক উপাদান কখনও কখনও বেশিরভাগ প্রযুক্তি-ব্যবস্থায় সবচেয়ে দুর্বল লিঙ্ক। এ বিষয়টির পর আলোকপাত করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রিয় উপায় হচ্ছে পিইবিকেএসি (প্রবলেম এক্সিস্টস বিটুইন কীবোর্ড অ্যান্ড চেয়ার)। আপনার পাসওয়ার্ড অন্যের সাথে শেয়ার করা, দুর্বল পাসওয়ার্ড ব্যহার করা, অথবা আরো দুর্বল পাসওয়ার্ড রিসেট করা– এসবই হচ্ছে খুব অনির্ভরশীল ডিজিটাল অথেন্টিকেশন অভিজ্ঞতা। আমরা নিজেরাও সিস্টেমের ডিজাইনার। এর অর্থ হচ্ছে, আমরাই আমাদের স্মার্টনেস ছাপিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। অলসভাবে সেট করা প্রতিটি দুর্বল পাসওয়ার্ডের অর্থ সেখানে রয়েছে অ্যাক্সেস করার জন্য হ্যাকার বা তার বট। এমনকি ফুল-প্রুফ টেকনোলজি, যেমন captcha (image used to verify that you are human and not a bot) হতে পারে পতনপ্রবণ। আসলে ইউজারনেম-পাসওয়ার্ড ধরনের ডিজিটাল অথেন্টিকেশন হতে পারে সম্ভবত সবচেয়ে বাজে ও দুর্বল, এরপরও এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি।

আরও নির্ভরযোগ্য ধরনের অথেন্টিকেশনের সুযোগ এনে দিয়েছে বায়োমেট্রিক। ছবিসহ ক্রেডিটকার্ড সংযোজন করেছে অথেন্টিকেশনের আরেকটি অতিরিক্ত স্তর– সিগনেচার আর ভালো নয়। ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার সবার বেলায় ব্যবহার সম্ভব নয়। কারণ তাদের সবার সেন্ট্রাল ডাটাবেজ নেই। আর এসব লোকের প্রাইভেসির ▸

প্রশ্নটিও রয়েছে। অতএব, আমাদের হাতে আর কী অবশেষ আছে? আমরা চিরদিন আরও রহস্যময়, আরও সবল পাসওয়ার্ড দিয়েই যাব? সম্ভবত নয়। এরই মধ্যে শোনা যাচ্ছে আইডেন্টিটির নিরাপত্তা দেয়ার জন্য অনন্য ডিজিটাল টাট্টো ব্যবহারের কথা। গবেষণা চলছে অনন্য আইডেন্টিফায়ার তৈরির জন্য, যা বিল্টইন থাকেবে পিল বা বড়ির মধ্যে। প্রতিটি বড়িতে থাকবে একটি করে অনন্য এক আরএফআইডি আইডেন্টিফায়ার, যা চলবে আপনার পাকস্থলীর হজমকারী বা ডাইজেস্টিভ এনজাইমের (জীবন্ত প্রাণীর দেহকোষে উৎপন্ন এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ, যা নিজে পরিবর্তিত না হয়ে অন্য পদার্থের পরিবর্তন করে) শক্তিতে। এ ধরনের টেকনোলজি আপনার পুরো দেহকে পরিণত করবে একটি আরএফআইডি ট্রান্সমিটারে। যদি একদিন এ পিল বা বড়ি খেতে ভুলে যান, কিংবা এক বৃহস্পতিবার রাতে দেখলেন আপনার কাছে এ বড়ি নেই– তখন কী হবে? তখন কি শুক্রবারটি কাটিয়ে দেবেন একদম কিছু না করে? কারণ আপনি যে সিস্টেম ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, তা আপনাকে করতে অনুমোদন দেয়নি। আর যে ব্যক্তি এ বড়ি সরবরাহ করতেন তিনি বাড়ি চলে গেছেন শুক্রবারটি পরিবারের সাথে কাটাবেন বলে। এ ক্ষেত্রেও ছোটখাটো উপায় আছে। তবে তা সে ধাপগুলো করতে হবে সঠিক উপায়ে।

অটোমেশন

টেকনোলজিকে যদি মহাকিছু বলতে হয়, তবে বলতেই হয় তা হচ্ছে অটোমেশনে। মানুষ যদি একটি কাজ শত শত বার করে, তবে সে কাজে একঘেয়েমি আসতে বাধ্য। কিন্তু টেকনোলজি ঠিক সে কাজটিই পারদর্শিতার সাথে করে। একটি সাধারণ ক্যালকুলেটর দূর করেছে লগের ছক ব্যবহার করে গুণ-ভাগের জটিল হিসাব। অ্যাকাউন্টিংয়ের যে কাজ বারবার করতে হতো, তা এখন করে দিচ্ছে রোবট। টেকনোলজি কাজের একঘেয়েমি দূর করেছে। মানুষ অটোমেশন সিস্টেম উদ্ভাবন করে একঘেয়েমির কাজগুলো হারিয়ে ফেলছে। টেকনোলজি মানুষকে আরেকটি বিষয় দিয়েছে। তা হলো গতি, যদিও মানুষ একটি কাজ একবার করার বেলায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অটোমেটেড সলিউশন থেকে দ্রুততর। কিন্তু একটি কাজ বারবার, শতবার, হাজারবার লাখোবার, কোটিবার করতে হলে তা মেশিনের গতিতে মানুষ করতে পারে না। ১৪৪০ সালের দিকে যখন গুটেনবার্গ ছাপার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, তখন ছাপার কাজে নিয়োজিত অনেকে কাজ হারান। ডিজিটাল ছাপা এলে কাজ হারান টাইপসেটারেরা। তবে আজকের অটোমেটেড ডিজিটাল ছাপা আগের তুলনায় অনেক অনেক বেশি স্পষ্ট ও ঝকঝকে। এর আরও আগে উদ্ভাবন করা হয় চাকা। এর ফলে দুর্বল মানুষও পণ্য স্থানান্তর করতে পারে সহজেই। অটোমেশন একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া। আর এ পথেই পৃথিবী এগিয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও আপনি যদি নিজেকে এই ভেবে নিরাপদ মনে করেন, আমি ক্রীড়া সাংবাদিক কিংবা শেয়ারবাজার বিশ্লেষক, মেশিনই আমার কাজ করে দিচ্ছে– তবে আপনাকে নতুন করে আবারও ভেবে দেখার অবকাশ আছে।

আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স : আমরা Turing Test-এর কথা শুনেছি। মানুষ যে ধরনের বুদ্ধিভিত্তিক সক্ষমতা দেখাতে পারে, তার সমকক্ষ আচরণ একটি মেশিন কতটুকু দেখাতে পারে, তা পরিমাপ করা হয় এই তুরিং টেস্টের মাধ্যমে। হতে পারে একটি মেশিন এখনও তুরিং টেস্টে পাস করতে পারবে না। এ পরীক্ষার জন্য মূলত একটি মেশিনকে হতে হবে ঠিক মানুষের মতোই হুবহু সক্ষম। আমরা সবাই একজন

জাইরোস্কোপ

Jarvis চাই। জারবিস আয়রনম্যান ছবির টনি স্টার্কের একটি সহায়ক চরিত্র। এটি টনি স্টার্কের হোম কমপিউটিং সিস্টেম, যা বাড়ির সবকিছু দেখাশোনা করে– কোনো কিছু গরম করা, ঠাণ্ডা করা, যন্ত্র বিশ্লেষণ করা থেকে শুরু করে বলা যায় সবকিছু করে। কিন্তু জারবিস নিয়ে আমরা বাস্তবে কতটুকু এগিয়ে যেতে পারব? উদাহরণ টেনে বলা যায়, আমরা সবাই প্রাণী পুষি। পোষা প্রাণী আমাদের খুব প্রিয়। আপনকি কি প্রত্যাশা করেন আপনার পোষা কুকুর চেয়ারে বসে ব্রিটিশদের বাচনভঙ্গিতে আপনার আসবাবপত্রের সমালোচনা করে কথা বলবে? কুকুরটি কি চেয়ারে বসে একজন অতিথির মতো চা-পানে আপ্যায়িত হওয়ার প্রত্যাশা আপনার কাছ থেকে করবে? কিংবা কুকুরটি এ ধরনের কিছুই করবে না বলে কি আপনি ধরে নেবেন, কুকুরটি আপনার দরজার নবের মতো কালা কিংবা বোবা?

আমরা কয়েক বছর ধরেই আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতি লক্ষ করে আসছি। তবুও তুরিং টেস্ট পাস করার মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কোনো যন্ত্র বানানোর ধারেকাছে এখনও পৌঁছতে পারিনি। এর পরও যদি আমরা বলি মেশিন বা যন্ত্র হচ্ছে কালা-বোবা, তবে মিথ্যা বলা হবে। আপনি যদি http://www.forbes.com/sites/narrativescience/-এ ঘুরে আসেন, তবে এমন অনেক খবরই পড়তে পারবেন যার সবই লিখছে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্ট সফটওয়্যার। স্থানাভাবে এ ধরনের কোনো নমুনা রিপোর্ট এখানে উপস্থাপন করা গেল না।

সেন্সর

যুগ যুগ ধরে আমরা কাজ করে আসছি এমন এক সেন্সরের খুঁজে, যা মানুষের সেন্স থেকে হবে আলাদা। আরও সঠিকভাবে শোনা, আরও স্পষ্ট এবং নির্ভুলভাবে দেখা, শুধু গন্ধ নেয়া নয়, বায়ুতে এর উপাদানগুলো চিহ্নিত করা– এসব ও আরও অনেক কিছু আজ করা হচ্ছে সেন্সর দিয়ে। সরচেয়ে সরল ও সাধারণ যেসব সেন্সরের সাথে আমরা পরিচিত, তা হচ্ছে থার্মোমিটার কিংবা অন্য কোনো ধরনের টেম্পারেচার সেন্সর। এটি আপনার জ্বরের মাত্রা পরিমাপই করুক কিংবা আপনার কক্ষের এয়ার কন্ডিশনারের তাপমাত্রায় সাযুজ্য বিধানের কাজেই ব্যবহার করা হোক, এখানে কাজ করে একটি সেন্সর। আর এখানেই শেষ নয়। যেখানেই যাবেন, আপনার চারপাশে কাজ করছে নানা সেন্সর জীবনযাপনকে আরামদায়ক করে তোলার জন্য। কোনো শপিং মলে কিংবা বড় বড় ভবনে গেলে দেখবেন সেখানে রয়েছে অটোমেটিক ডোর। সেন্সরই এগুলো চালায়। গাড়িতে সবকিছুর জন্য রয়েছে সেন্সর। দরজা খোলা, সিটবেল্ট বাঁধা, ইন্ডিকেটর্স, ওভারহিটিং, জ্বালানি কমে যাওয়া ইত্যাদিসহ প্রায় সব সতর্কসঙ্কেতই দেয় সেন্সর। এমনকি আপনার কমপিউটার ও স্মার্টফোন ভর্তি রয়েছে নানা সেন্সর।

অ্যাক্সিলারোমিটার ও জাইরোস্কোপ : আপনার স্মার্টফোন যতবারই ঘোরান, দেখবেন এর স্ক্রিনও ঘুরছে। যখন স্ক্রিন নিচের দিকে চলে যাবে, তখন আপনি তা পড়তে পারবেন না। আপনি তখন এর উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারবেন মাত্র। জাইরোস্কোপ হচ্ছে ঘূর্ণায়মান বা আবর্তনশীল বস্তুর গতিতত্ত্ব ব্যাখ্যার যন্ত্রবিশেষ। অতএব এ যন্ত্রটি সবসময় জানে কোথায় যন্ত্রটির ওপরের দিক এবং কোনদিকে আছে এর নিচের অংশ। প্রোগ্রামার, টলারেন্স সেট করে দেয়। কিন্তু কোড ডিভাইস একটি নির্দিষ্ট উপায়ে স্ক্রিন ওরিয়েন্টেশন সুইচ করে, অর্থাৎ স্ক্রিনের অবস্থান নির্ণয় করে। অপরদিকে জাইরোস্কোপ কিছু পরিবর্তন পাঠ করে কিছু সেট মাত্রার মাধ্যমে। ফলে আপনি যখন ফোনের ওপরের দিকটা নিচু করে ধরেন, তখন স্ক্রিনও ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যায়।

অ্যাক্সিলারোমিটার এ থেকে একটু ভিন্ন। কারণ এটি সাধারণত দুই অক্ষের মধ্যবর্তী স্থানের রৈখিক গতি পরিমাপ করে। এমনকি যখন ফোন টেবিলে রাখা থাকে, কোনো নড়াচড়া করে না, অ্যাক্সিলারোমিটার ধরতে পারে এর ওপর কী পরিমাণ অভিকর্ষ বল কাজ করছে। কিন্তু এটি দেখায় জিরো লিনিয়ার মুভমেন্ট। জাইরাস্কোপ জানবে ফোনটির ওপরের দিক নিচে আছে কি না, অথবা এটি এর প্রতিটি পাশের ওপর ভারসাম্যাবস্থায় আছে কি না, ইত্যাদি ▸

বিষয় এবং এই যন্ত্রটি সিদ্ধান্ত নেবে, পর্দাটি এভাবে না ওভাবে রাখতে হবে। তা সত্ত্বেও আপনি যদি ফোনটি টেবিল বরাবর পিছনে একটু সরান, জাইরোস্কোপ ধরতে পারবে না কোনো পার্থক্য। কিন্তু অ্যাক্সিলারোমিটার জানতে পারবে, কোন পথ বরাবর ফোনটি সরানো হয়েছে, কয় সেকেন্ড সময় ধরে, সেকেন্ডে কত মিটার বেগে। আর এ ডাটা ব্যবহার করে জানা যাবে আপনি কী বেগে হাঁটছেন, গাড়ি চালাচ্ছেন কিংবা সাইকেল চালাচ্ছেন।

প্রায়ই টেকনোলজি ডিভাইসগুলোতে অ্যাক্সিলারোমিটার ও জাইরোমিটার (এ-জি) উভয়ই ব্যবহার হয় বস্তুর যথার্থ ওরিয়েন্টেশন বা ঘূর্ণন অবস্থান এবং ত্বরণ বা গতির ডাটা পাওয়ার জন্য। Nintendo Wii যখন প্রথম চালু করা হয়, তখন তাতে ঠিক এ পদ্ধতিটিই ব্যবহার করা হয়, যাতে আপনি মোশন-ভিত্তিক গেম খেলার সুযোগ পান। তা চিরদিনের জন্য কন্সোল ও গেম সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেয়।

এটি হচ্ছে সাধারণ ব্যক্তিগত উপায়, যেভাবে আপনি জড়িয়ে আছেন এ-জি'র সাথে। কিন্তু এগুলোর ব্যবহার রয়েছে আমাদের জীবনের আরও নানা ক্ষেত্রে। অটোপাইলট সিস্টেম কাজ করতে ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) সমন্বিত এ-জিগুলোর ওপর।

অনেকগুলো সেন্সরসমৃদ্ধ অ্যাক্সিলারোমিটার ব্যবহার করে বিমান নির্ণয় করতে পারে এর নিজের গতির দিক এবং তা যখন জাইরোস্কোপে সংযুক্ত করবেন, তখন এটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে কাত হওয়ার কোণের তথা অ্যাঙ্গেল অব টিল্টের পরিমাণসহ আরও অনেক কিছু। আগে থেকে প্রোগ্রাম করা কোনো সিস্টেমে যদি এসব ডাটা ঢোকানো হয়, তখন এ সিস্টেমের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে বিমানের থ্রটল (ইঞ্জিনে বাষ্প ও পেট্রোলের ধোঁয়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের কপাটক বা রোধনী) ও ফ্ল্যাপ (পাখা ঝাপটানো নিরোধ) সিস্টেম, যাতে করে সঠিক দিকে স্থিতিশীলভাবে বিমানের চলা নিশ্চিত করা যায়। যারা এরই মধ্যে MEMS (মাইক্রো-ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল সিস্টেম)-এর সাথে পরিচিত, তারা বুঝবেন এটি মূলত জাইরোস্কোপের মতো সেন্সরের একটি মাইক্রোমিটার সংস্করণ মাত্র। কিন্তু এটি সিলিকনের তৈরি এবং এতেও রিডিং রিসিভ ও ট্রান্সমিট করার জন্য আছে মাইক্রোপ্রসেসর। বিমানে ও অন্যান্য যানবাহনে, যেমন গাড়িতেও ব্যবহার হয় একই মোড। গাড়িতে এ-জিগুলো অন্যান্য সেন্সরের সাথে একসাথে কাজ করতে পারে। তখন ট্রাকশন কন্ট্রোল ও অ্যান্টিলক ব্র্যাকিং সিস্টেম (এবিএস) একসাথে কাজ করে নিরাপদে গাড়ি চড়া নিশ্চিত করতে। এসব সেন্সরের অনেকগুলোই একসাথে কাজ করে ইএসসি/ইএসপি (ইলেকট্রনিক স্ট্যাবিলিটি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম) ফিচার গড়ে তোলার জন্য, যা প্রায় সব মাঝারি ও উঁচু মানের গাড়িতে থাকে। এটি বেশি গতির গাড়ির স্টিয়ারিং সেনসিভিটি অ্যাডজাস্টের কাজে সহায়তা করে। মোড় ঘোরার সময় গাড়ি যাতে ছিটকে না পড়ে সেজন্য ইঞ্জিনের শক্তি কমিয়ে দিতেও সহায়তা করে।

নিজেই করুন নিজের প্রসথেটিক প্রোগ্রামিং

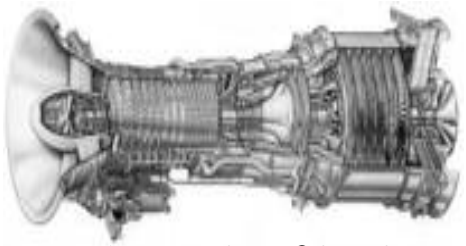

গ্যাস টারবাইন; যে ইঞ্জিন আগামী দিনের শক্তি

এখানেই শেষ নয়। আজকের দিনের ইমেজ স্ট্যাবিলাইজেশন ফিচারসমৃদ্ধ ডিজিটাল ক্যামেরার ফিচারেও ব্যবহার হয়েছে এ-জি সিস্টেম, যাতে আপনি পেতে পারেন শঙ্কামুক্ত স্পষ্ট ছবি। এটি জাহাজ থেকে শুরু করে কার্গো ট্রাক, গেমিং কন্সোল, আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্র, হাবল টেলিস্কোপ, সেগওয়ে (পার্সোনাল ইলেকট্রনিক ব্যালেন্সিং ট্রান্সপোর্ট), হার্ডড্রাইভ ও সব স্মার্টফোন, ট্যাবলেট ও এমনি ধরনের আরও অনেক কিছুতেই ব্যবহার হয় এ-জি সিস্টেম।

মেডিক্যাল : এমনকি সেন্সর বদলে দিচ্ছে চিকিৎসা জগতটাও। সেন্সরের দাম কমছে ও ব্যবহার হচ্ছে প্রচুর। যদি ব্লাডসুগার কিংবা ব্লাডপ্রেসার নিয়ে শঙ্কিত হন, তবে সোজা ওষুধের দোকানে গিয়ে কিনে নিয়ে আসুন একটি হোম টেস্টিং কিট। এসব ব্যাটারিচালিত কিট সহজেই জানিয়ে দেবে আপনার রক্তচাপ ও ব্লাডসুগারের মাত্রা। এসব চেকআপের জন্য আপনাকে আর হাসপাতাল বা ক্লিনিকে যেতে হবে না। এমনকি এক্স-রের কাজও আজ চলছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। সেন্সর ব্যবহার করে অনেকটা ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তোলার মতো আজ এক্স-রের কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। এখন এক্স-রে আপনি ডিজিটাল উপায়ে স্টোর করতে পারবেন, যা প্রিন্ট করা যাবে বারবার। তা ছাড়া তা দূরে কোথাও কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে পাঠানোও যাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে এক্স-রে ফিল্মে রাসায়নিক ব্যবহার হয় না। তাই এই এক্স-রে ইমেজের স্পষ্টতা ও রেজ্যুলেশন আরও বাড়ানো সম্ভব। একটি খারাপ ইমেজকে যেমন ফটোশপে আরও উন্নত মানে নেয়া যায়, তেমনি এ এক্স-রের মানও উন্নত করা সম্ভব।

চিকিৎসার বেলায় একটি সুপরিচিত প্রবাদ হচ্ছে : প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর। অর্থাৎ রোগ সারানোর চেয়ে রোগ প্রতিরোধ অধিক ভালো। আগেভাগে রোগ চিহ্নিত করা কিংবা স্বাস্থ্য পরিস্থিতি জানার অপর অর্থ আরও ভালোভাবে বাঁচা। এমআরআই (ম্যাগনেটিক র‍্যাজোনেন্স ইমেজিং) থেকে শুরু করে পেসমেকার মনিটর পর্যন্ত সবকিছুই চলে সেন্সরের জোরে। আসছে তারবিহীন বিদ্যুতের যুগ। আর এখন গবেষণা চলছে মাইক্রোস্কোপিক সেন্সর উদ্ভাবনের লক্ষ্যে। এসব ছোট আকারের সেন্সর আপনার চামড়ার নিচে এমবেডেড করা যাবে। রিডিং নেয়ার সময় তা চলবে হাতে থাকা এক্সটার্নাল রিসিভার ডিভাইস দিয়ে। ফলে একজন চিকিৎসকের জন্য সহজ হয়ে যাবে রোগীর স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখার কাজটি। এখন আর ইনজেকশনের সুই ঢুকিয়ে রক্ত সংগ্রহ করে স্বাস্থ্য পরীক্ষার দরকার হবে না।

ব্যায়াম ও খেলাধুলা সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বিধানের প্রয়োজন আছে। সেন্সর আপনাকে বলে দেবে আপনি কতটুকু হেঁটেছেন, কত পরিমাণ ক্যালরি কাজে লাগিয়েছেন, ইত্যাদি। বাইপাস সার্জারি করা রোগীর প্রয়োজন ওজন অনুপাতে ওষুধের মাত্রা নির্ধারণ। বাড়তে-কমতে পারে এ মাত্রা। পরিবর্তিত মাত্রা নির্ধারণ করে দেবে সেন্সর। এক্স-রে, সনোগ্রাফি ও এমনকি ডিজিটাল পাল্লায় ওজন মাপার যন্ত্রেও আছে সেন্সর। আজকের উন্নত চিকিৎসার মূলে সেন্সরের অবদান অপরিসীম।

ভবিষ্যৎ সেন্সিং : আগামী দিনে সেন্সিং আরও ব্যাপক হতে যাচ্ছে। সেন্সিং সব সময়ই অদৃশ্য। দেখার জন্য চাই চোখ, গন্ধ নেয়ার জন্য নাক, স্পর্শ অনুভবের জন্য আঙুল, সবকিছু ব্যাখ্যার জন্য মস্তিষ্ক। ঠিক তেমনি সেন্সর সৃষ্টি করেছে আমাদের অনুভবের নানা মেকানিক্যাল সিস্টেম। সেন্সর ছাড়া প্রতিদিন এলিভেটর ডোর হতো না নিরাপদ, রোবটের বাহু কারখানাগুলোতে ঘটাত নানা দুর্ঘটনা, লিফট চড়া হতো বিপজ্জনক। ইনভিজিবল টেকনোলজি ▸

দিনে দিনে আমাদের প্রতিদিনের জীবনে আরও পরিব্যাপক হয়ে উঠছে। যেখানেই থাকুন সেন্সর আপনাকে রাখবে নিরাপদ, তা দেখা না যাক কিংবা অনুভব না করা যাক। বললে ভুল হবে না, সেন্সর চালাবে আগামী দিনের দুনিয়া।

সময়ের সাথে উদ্ভাবিত হচ্ছে নতুন নতুন ধরনের সেন্সর। সবচেয়ে নতুন ধরনের সেন্সরের একটি হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড তথা ইএফ সেন্সর। দুটি পয়েন্টের মধ্যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের পরিবর্তন সেন্সিং করে এ সেন্সর কাজ করে। এটি নানা বাধা পেরিয়ে কাজ করতে সক্ষম। কঠিন পদার্থের মাধ্যমে মুভমেন্ট ও ইলেকট্রিক ফিল্ডের পরিবর্তন সেন্সিং করার সক্ষমতা এ সেন্সরকে বেশ কয়েকটি কারণে সম্ভাবনাময় করে তুলেছে। প্রথমত, এগুলো কঠিন পদার্থের স্তরে লুকিয়ে রাখা যাবে, রাখা যাবে গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলে। হুইল থেকে আপনার হাত কখনও সরে গেলে সেন্সর তা ধরে ফেলবে। সফটওয়্যার ব্যবহার করা যাবে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামের জন্য। যেমন– হুইলে হাত না রেখে ঘণ্টায় ২৫ কিলোমিটারের বেশি বেগে গাড়ি চালানো, গাড়ি চালানোর সময় চালক ঘুমিয়ে পড়লে সাউন্ড অ্যালার্ম দেয়া ইত্যাদি। এটিকে প্রোগ্রাম করা যাবে গাড়ির গতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমিয়ে দেয়া, হ্যাজার্ড লাইট জ্বালানো এবং চালক আহত হলে কিংবা মারা গেলে গাড়ি ধীরে ধীরে থামিয়ে দেয়ার জন্য। দ্বিতীয়ত, এসব সেন্সর আসলে খুবই কম বিদ্যুতে চলে, যে কারণে হাতে থাকা ডিভাইসের জন্য এগুলো আদর্শ হিসেবে বিবেচিত।

কয়েক বছর আগে ইন্টেল প্রদর্শন করে একটি রোবট বাহু। এতে খালি বোতল চেনার জন্য ইএফ সেন্সর ব্যবহার করা হয়। ধরা যাক, একই ধরনের তিনটি বোতল রোবটের সামনে রাখা হলো, যার মধ্যে একটি খালি। রোবট বোতল স্পর্শ না করেই খালি বোতল চিনে নিয়ে তা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। এর অর্থ হচ্ছে, আমরা এরই মধ্যে এমন রোবট পেয়ে গেছি, যা খালি বোতল ও ভরা বোতল চিনতে পারে, পাতলা ও ভারির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। আর রোবট বুঝতে পারে কতটুকু বল প্রয়োগ করে হালকা খালি বোতলটি তুলে আনতে হবে, ঠিক আমরা যেমন বুঝি একটি খালি ও ভরা কাপ তুলতে কোনটাতে কত পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে হবে। রোবট সেন্সর ব্যবহার করে আমরা আজ তা করতে পারি।

সম্প্রতি স্পেনের ইউনিভার্সিডাড পলিটেকনিকা ডি মাদ্রিদের বিজ্ঞানীরা প্রদর্শন করেছেন Rosphere, যা মূলত একটি রোবট। এ রোবটে থাকবে ক্যামেরা ও ইএফ সেন্সর। এ রোবট জমির ওপর দিয়ে চলে বলে দিতে পারবে এর মাটি উপযুক্তভাবে ভেজা আছে কি না, এর তাপমাত্রা ঠিক আছে কি না। তা চাষির রিসিভারে রিপোর্ট করতে পারবে। এর ফলে কৃষিকাজ আরও সহজতর হবে। ভালোভাবে ফসল ফলানোর সুযোগ মিলবে।

ইঞ্জিন ও পরিবহন

দুনিয়াটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। এর জন্য ধন্যবাদ পাওয়ার দাবি রাখে মানুষের উদ্ভাবিত নানা ধরনের ইঞ্জিন। বিমানের জেট ইঞ্জিন আপনাকে নিয়ে যায় মহাদেশ থেকে মহাদেশান্তরে। ইন্টার্নাল কমবাশ্চন ইঞ্জিন বা অন্তর্দহন যন্ত্র নিয়ে যায় নগর থেকে নগরে, এমনকি দেশ থেকে দেশে। রকেট আমাদের নিয়ে যায় মহাকাশে, ভিন গ্রহে। ইঞ্জিন আমাদের সহায়তা করে পর্যটনে, পণ্য পরিবহনে। সাহায্য করে চাহিদা মতো বিভিন্ন দেশে পণ্য পরিবহন করতে। তা সত্ত্বেও ইঞ্জিনগুলো জ্বালানি পুড়ে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করছে। ইলেকট্রিক ইঞ্জিন কম ধোঁয়া উদগীরণ করে পৃথিবীটাকে সবুজ রাখতে চায়। এমনকি ব্রাউন মেথড (গ্রিন মেথডের বিপরীত) ব্যবহার করেও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। আমরা এখন এক ধরনের অচলাবস্থায় আছি। টেরিস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনের জ্বালানি দক্ষতা অপর্যাপ্ত হওয়া এবং ইন্টারস্টেলার ড্রাইভের অভাবে বাতিল করা হচ্ছে মহাকাশ ভ্রমণ। আসলে আমরা সমাধান করতে পেরেছি ইন্টারপ্ল্যানেটারি ড্রাইভের বিষয়টি। অতএব, এরপর আমরা কোথায় যাব? ধন্যবাদ প্রযুক্তিকে, এরপরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের রয়েছে সিলভার লাইনের একটি থিন স্লিভার। এমনকি বিদ্যমান ইঞ্জিনের পরিবর্তন সাধন করে আমরা আরও বেশি পরিবেশবান্ধব ইঞ্জিন পেতে পারি। তা যদি নাও হয়, তবে কম বিদ্যুৎ খরচের ও কম জ্বালানির ইঞ্জিন আমরা পাব। যেখানে জ্বালানির দাম আজ আকাশচুম্বী, সেখানে এটিও আমাদের বহু প্রত্যাশিত একটি সমাধান।

সোলার সেইল : সূর্যকে একটি ইঞ্জিন হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভবত বেশি দূরত্বের গ্রহে সফর করার সবচেয়ে সস্তা ও সর্বোত্তম একটি উপায় হতে পারে। গত একশ' বছর ধরে সোলার সেইল (solar sail) বা সৌরপাল ছিল বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর একটি ধারণা। ১৬১০ সালে বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহান্স কেপলার গ্যালিলিওর কাছে একটি চিঠি লিখে প্রথমবারের মতো সোলার সেইলের কথা উল্লেখ করেন। তিনি এই চিঠি লিখেন তখন, যখন দেখেন ধূমকেতুর পুচ্ছ সবসময় সূর্যের বিপরীত দিকে বিস্তৃত। এর অর্থ হচ্ছে এক ধরনের কারেন্ট বা প্রবাহ সূর্য থেকে বেরিয়ে আসছে। এর ফলে তিনি তাত্ত্বিকভাবে ভাবেন, নৌকার পালের মতো সৌরপালও চলতে পারে। তার কথা হচ্ছে : 'Provide ships or sails adapted to the heavenly breezes, and there will be some who will brave even that void'।

তার এ কথা সত্যে পরিণত হয় ঠিক ৪০০ বছর পর। জাপানিরা ২০১০ সালের মে মাসে উৎক্ষেপণ করে IKAROS (Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun)। এটি ছিল সৌরপাল ধারণার প্রথম ব্যবহারিক পরীক্ষা। এটি যে লক্ষ্যে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে সে লক্ষ্য এরই মধ্যে অর্জিত হয়েছে। সৌরপাল কাজ করে এবং IKAROS-কে এখন স্বীকার করা হয় সবচেয়ে ছোট মহাকাশযান হিসেবে, যেটি সৌরপালের সাহায্যে উড়েছে আমাদের মূল্যবান সৌরব্যবস্থার গ্রহগুলোর মধ্যে। যদি এ ব্যাপারে আরও গবেষণা চলে তবে এটি কল্পনা করা কঠিন নয় যে, বড় বড় সৌরপাল বিভিন্ন গ্রহে নিয়ে যাবে ছোট ছোট মহাকাশযান। আর এর ফলে আমাদের কাছে খুলে যাবে ভিনগ্রহে উপনিবেশ স্থাপনের পথ। সুখের কথা, মহাকাশে রয়েছে প্রচুরসংখ্যক গ্রহ-উপগ্রহ।

উন্নততর কমবাশ্চন : প্রায় এক শতাব্দী পর শুধু বর্ধনগত পরিবর্তন আনা হয়েছে আইসিই তথা ইন্টার্নাল কমবাশ্চন (অন্তর্দহন) ইঞ্জিনে। নিশ্চিতভাবে একশ' বছরে জ্বালানি দক্ষতা দ্বিগুণে পৌঁছেছে। আর হর্স-পাওয়ার আগের তুলনায় বেড়েছে ১০ গুণ। কিন্তু আপনি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এই শত বছর সময়ে এই সামান্য পরিমাণ উন্নয়নে কি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন? জ্বালানি পোড়ানোর পরিমাণ কমেছে। ক্ষমতা বেড়েছে। চাকার গতিও বেড়েছে। এ উন্নয়ন যথেষ্ট নয়। স্কুডেরি (Scuderi) গ্রুপ আইসিই'র উন্নয়নে কাজ করছে। এ গ্রুপ এর দক্ষতা বাড়িয়েছে। এখন আইসিইতে জ্বালানির দুই-তৃতীয়াংশই নষ্ট হয়ে যায়। স্কুডেরি আশা করছে, এ সমস্যার সমাধান এরা করতে পারবে। এদের নানা উদ্যোগের কথা জানার জন্য ঢুকে পড়ুন http://www.scuderi-group.com/technology/ ঠিকানায়। কিন্তু তাদের দেয়া মৌল ধারণা হচ্ছে কমবাশ্চন ও এক্সহস্ট সিলিন্ডার আলাদা করে ইঞ্জিনের দক্ষতা বাড়ানো। একটি সাধারণ আইসিই চলে চার পর্যায়ে : জ্বালানি গ্রহণ, জ্বালানি ও বায়ুর মিশ্রণের সঙ্কোচন, কমবাশ্চন (দহন) এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে এক্সহস্ট (বাষ্প নির্গমন)। স্কুডেরির লক্ষ্য দুই সিলিন্ডারে চলবে কমপ্রেশন (সঙ্কোচন) ও অন্য দুই সিলিন্ডারে চলবে কমবাশ্চন (দহন)। পাওয়ার স্ট্রোকের (কমবাশ্চন) বদলে সাধারণ আইসিই ইঞ্জিনের প্রতি দুই ঘূর্ণনের জায়গায় স্কুডেরি ইঞ্জিনে থাকবে প্রতিঘূর্ণনে দহনের ব্যবস্থা। ফলে একটি চার সিলিন্ডারের ইঞ্জিন কাজ করবে দুই স্ট্রোকের ইঞ্জিনের মতো। এ ডিজাইন সুযোগ করে দিয়েছে আরও কিছু সৃজনশীল চিন্তাভাবনার। যেহেতু সিলিন্ডার চারটি কাজের দিক থেকে এক নয়, সেহেতু কমপ্রেশন ও কমবাশ্চন সাইক্লিক অর্ডারে অর্থাৎ পালাক্রমে চলবে না। যখন গাড়ি দ্রুতগতিতে কিংবা ঢালু পথে চলবে, তখন কমপ্রেসড এয়ার একটি ট্যাঙ্কে জমা রাখা যাবে এবং তা পরে গাড়ি চালানোর কাজে ব্যবহার করা যাবে, জ্বালানি খরচ না করেই। তাত্ত্বিকভাবে ইঞ্জিন হবে আরও দক্ষ ও ধোঁয়া নির্গমন কমবে। এর ফলে গাড়ি হবে আরও পরিবেশবান্ধব।

অদৃশ্য, অজেয়, অপরিহার্য

এই ইনভিজিবল, ইনভিনসিবল ও ইনয়েভিটেবল (অদৃশ্য, অজেয়, অপরিহার্য) টেকনোলজি বিরামহীনভাবে আমাদের জীবনের সাথে সমন্বিত হতে থাকবে। শুধু স্মার্টফোনই আপনার-আমার জীবনমান উন্নত করবে না। অদৃশ্য প্রযুক্তি সত্যিকার অর্থে আমাদের জীবনকে উন্নততর করবে। যেসব ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা হলো এ প্রতিবেদনে, সেগুলো আমাদের সুযোগ করে দেবে উন্নততর জীবনের। তবে গবেষণার গতিধারা নির্ণয় করবে কে দেবে এ ইনভিজিবল টেকনোলজি জগতের নেতৃত্ব। কে কতটা কাজে লাগাতে পারবে গুরুত্বপূর্ণ এ প্রযুক্তিকে

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট ও ডিজিট